এখন সমালোচনা শুরু করে দেবার পূর্বেই কথাটার একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ, ঐ শব্দটি আমরা ঠিক অর্থে ব্যবহার করি কি না, সেবিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। প্রথমেই, 'সম্'-উপসর্গটির যে বিশেষ-কোনো সার্থকতা আছে, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। শব্দ অতিকায় হলে যে তার গৌরব-বৃদ্ধি হয়, একথা আমি মানি; কিন্তু দেহভারের সঙ্গে সঙ্গে যে বাক্যের অর্থভার বেড়ে যায়, তার কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ যুগের লেখকেরা মাতৃভাষায় লিখেই সন্তুষ্ট থাকেন না, কিন্তু সেইসঙ্গে মায়ের দেহপুষ্টি করাও তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু, সে পুষ্টিসাধনের জন্য বহুসংখ্যক অর্থপূর্ণ ছোট-ছোট কথা চাই, যা সহজেই বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হতে পারে। স্বল্পসংখ্যক এবং কতকাংশে নিরর্থক বড়-বড় কথার সাহায্যে সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। সংস্কৃতভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য; কিন্তু সেই স্বল্প পরিচয়েই আমার এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, সে ভাষার বাক্যাবলী আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন। সংস্কৃতের উপর হস্তক্ষেপ করবামাত্রই তা আমাদের হস্তগত হয় না। বরং আমাদের অশিক্ষিত হাতে পড়ে প্রায়ই তার অর্থবিকৃতি ঘটে। সংস্কৃতসাহিত্যে গোঁজামিলন-দেওয়া জিনিসটা একেবারেই প্রচলিত ছিল না। কবি হোন্, দার্শনিক হোন্, আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রত্যেক কথাটি ওজন করে ব্যবহার করতেন। শব্দের কোনোরূপ অসংগত প্রয়োগ সেকালে অমার্জনীয় দোষ বলে গণ্য হত। কিন্তু একালে আমরা কথার সংখ্যা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওজনের ধার বড়-একটা ধারি নে। নিজের ভাষাই যখন আমরা সূক্ষ্ম অর্থ বিচার করে ব্যবহার করি নে, তখন স্বল্পপরিচিত এবং অনায়ত্ত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করে-ব্যবহার করতে গেলে সে ব্যবহার যে বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তা আমি জানি। তবুও একেবারে বেপরোয়াভাবে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত-ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তাতে মনোভাবও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না, এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, এই 'সমালোচনা'-কথাটা আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি, তার আসল অর্থ ঠিক তা নয়। আমরা কথায় বলি 'লেখাপড়া' শিখি; কিন্তু আসলে আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শুধু পড়তেই শিখি, লিখতে শিখি নে। পাঠকমাত্রেরই পাঠ্য কিংবা অপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবার ক্ষমতা থাক্ আর না থাক্, মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে; বিশেষত সে কার্যের উদ্দেশ্য যখন আর-পাঁচজনকে বই পড়ানো, লেখানো নয়। সুতরাং সমালোচিতব্য বিষয়ের বাংলাসাহিত্যে অভাব থাকলেও সমালোচনার কোনো অভাব নেই। এই সমালোচনা-বন্যার ভিতর থেকে একখানিমাত্র বই উপরে ভেসে উঠেছে। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলোচনা'। তিনি যদি উক্ত নামের পরিবর্তে তার

'সমালোচনা' নাম দিতেন, তাহলে, আমার বিশ্বাস, বৃথা বাগাড়ম্বরে 'আলোচনা'র ক্ষুদ্র দেহ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এত গুরুভার হয়ে উঠত যে, উক্ত শ্রেণীর আর-পাঁচখানা বইয়ের মত এখানিও বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে যেত। এই দুটি শব্দের মধ্যে যদি একটি রাখতেই হয়, তাহলে 'সম্' বাদ দিয়ে 'আলোচনা' রক্ষা করাই শ্রেয়। যদিচ ওকথাটিকে আমি ইংরেজি criticism শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বলে মনে করি নে। আলোচনা মানে 'আ' অর্থাৎ বিশেষরূপে 'লোচন' অর্থাৎ ইক্ষণ। যেবিষয়ে সন্দেহ হয়, তার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্য বিশেষরূপে সেটিকে লক্ষ্য করে দেখবার নামই আলোচনা। তর্কবিতর্ক বাগ্‌বিতণ্ডা আন্দোলন-আলোড়ন প্রভৃতি অর্থেও ঐ কথাটি আজকালকার বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ওকথায় তার কোনো অর্থই বোঝায় না। 'আলোচনা' ইংরেজি scrutinize শব্দের যথার্থ প্রতিবাক্য। Criticism শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় না থাকলেও, 'বিচার' শব্দটি অনেকপরিমাণে সেই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু 'সমালোচনা'র পরিবর্তে 'বিচার' যে বাঙালি সমালোকদের কাছে গ্রাহ্য হবে, এ আশা আমি রাখি নে। কারণ, এঁদের উদ্দেশ্য— বিচার করা নয়, প্রচার করা। তাছাড়া যেকথাটা একবার সাহিত্যে চলে গেছে, তাকে অচল করবার প্রস্তাব অনেকে হয়ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় বলে মনে করবেন। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্বে যখন আমরা নির্বিচারে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দকে বঙ্গসাহিত্যের কারাগারে প্রবেশ করিয়েছি, এখন আবার সুবিচার করে তার গুটিকতককে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় অন্যায় কার্য হবে না। আর-এক কথা। যদি criticism অর্থেই আমরা আলোচনা শব্দ ব্যবহার করি, তাহলে scrutinize অর্থে আমরা কি শব্দ ব্যবহার করব? সুতরাং, যে উপায়ে আমরা মাতৃভাষার দেহপুষ্টি করতে চাই, তাতে ফলে শুধু তার অঙ্গহানি হয়। শব্দ সম্বন্ধে যদি আমরা একটু শুচিবাতিকগ্রস্ত হতে পারি, তাহলে, আমার বিশ্বাস, বঙ্গভাষার নির্মলতা অনেক পরিমাণে রক্ষিত হতে পারে। অনাবশ্যকে যদি আমরা সংস্কৃতভাষার উপর হস্তক্ষেপ করতে সংকুচিত হই, তাতে সংস্কৃতভাষার উপর অবজ্ঞা দেখানো হবে না, বরং তার প্রতি যথার্থ ভক্তিই দেখানো হবে। শব্দগৌরবে সংস্কৃতভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে তার ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাংলাসাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ করব, তাও ঠিক নয়। বাণী কেবলমাত্র ধ্বনি নয়। আমি বহুদিন থেকে এই মত প্রচার করে আসছি, কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেন না। সাহিত্যজগতে একশ্রেণীর জীব বিচরণ করে, যাদের প্রাণের চাইতে কান বড়। সংগীতচর্চার লোভ তারা কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না, এবং সে ব্যাপার থেকে তাদের নিরস্ত করবার ক্ষমতাও কারও নেই। প্রতিবাদ

করায় বিশেষ-কোনো ফল নেই জেনেও আমি প্রতিবাদ করি; কারণ, আজকালকার মতে, আপত্তি নিশ্চিত অগ্রাহ্য হবে জেনেও আপত্তি ক'রে আপত্তিকর জিনিসটে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য ক'রে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য বলে বিবেচিত হয়।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, কোনো বিশেষ লেখকের বা লেখার প্রতি কটাক্ষ করে আমি এসব কথা বলছি নে। বাংলাসাহিত্যের একটা প্রচলিত ধরণ ফ্যাশন এবং ঢঙের সম্বন্ধেই আমার আপত্তি, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই আমার উদ্দেশ্য। সমাজের কোনো চলতি স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে যে আমরা কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারি, এমন অন্যায় ভরসা আমি রাখি নে। সকল উন্নতির মূলে থামা জিনিসটে বিদ্যমান। এ পৃথিবীতে এমন-কোনো সিঁড়ি নেই, যার ধাপে ধাপে পা ফেলে আমরা অবলীলাক্রমে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। মনোজগতে প্রচলিত পথ ক্রমে সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে শেষে চোরা-গলিতে পরিণত হয়, এবং মানুষের গতি আটকে দেয়। বিজ্ঞানে যাকে ইভলিউশন বলে, এককথায় তার পদ্ধতি এই যে, জীব একটা প্রচলিত পথে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ডাইনে কি বাঁয়ে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করে এবং সাহস ক'রে সেই পথে চলতে আরম্ভ করে। এই নূতন পথ বার করা, এবং সেই পথ ধরে চলার উপরেই জীবের জীবন এবং মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। মুক্তির জন্যে, হয় দক্ষিণ নয় বাম মার্গ যে অবলম্বন করতেই হবে, একথা এদেশে ঋষিমুনিরা বহুকাল পূর্বে বলে গেছেন; অতএব একেলে বিজ্ঞান এবং সেকেলে দর্শন উভয়ই এই শিক্ষা দেয় যে, সিধে পথটাই মৃত্যুর পথ। সুতরাং বাংলা লেখার প্রচলিত পথটা ছাড়তে পরামর্শ দিয়ে আমি কাউকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি নে। আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত ছেড়ে যদি আমরা দেশী পথে চলতে শিখি, তাতে বাংলাসাহিত্যের লাভ বই লোকসান নেই। ঐ পথটাই তো স্বাধীনতার পথ, এবং সেই কারণেই উন্নতির পথ—এই ধারণাটি মনে এসে যাওয়াতেও আমাদের অনেক উপকার আছে। আমি জানি যে, সাহিত্যে কিংবা ধর্মে একটা নূতন পথ আবিষ্কার করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র দু-চারজন মহাজনেরই থাকে, বাদবাকি আমরা পাঁচজনে সেই মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে চলতে পারলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়ের অবলম্বন করা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিকও বটে, কর্তব্যও বটে; কেননা, পৃথিবীর সকল ভেড়াই যদি মেড়া হয়ে ওঠে তো ঢুঁ-মারামারি করেই মেষ-বংশ নির্বংশ হবে। উক্ত কারণেই আমি লেখবার একটা প্রচলিত ধরণের বিরোধী হলেও প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের বিরোধী নই। আমরা কেউ ভাষা-জিনিসটে তৈরি করি নে, সকলেই

তৈরি ভাষা ব্যবহার করি। ভাষা-জিনিসটে কোনো-একটি বিশেষ ব্যক্তির মনগড়া নয়, যুগযুগান্তর ধরে একটি জাতির হাতে-গড়া। কেবলমাত্র মনোমত কথা বেছে নেবার, এবং ব্যাকরণের নিয়মরক্ষা করে সেই বাছাই কথাগুলিকে নিজের পছন্দমত পাশাপাশি সাজিয়ে রাখবার স্বাধীনতাই আমাদের আছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা জহুরি, তাঁরা এই চলতি কথার মধ্যেই রত্ন আবিষ্কার করেন, এবং শিল্পগুণে গ্রথিত করে দিব্য হার রচনা করেন। নিজের রচনাশক্তির দারিদ্র্যের চেহারাই আমরা মাতৃভাষার মুখে দেখতে পাই, এবং রাগ করে সেই আয়নাখানিকে নষ্ট করতে উদ্যত হই ও পূর্বপুরুষদের সংস্কৃত দর্পণের সাহায্যে মুখরক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। একরকম কাঁচ আছে, যাতে মুখ মস্ত দেখায়, কিন্তু সেইসঙ্গে চেহারা অপরিচিত বিকটাকার ধারণ করে। আমাদের নিজেকে বড় দেখাতে গিয়ে যে আমরা কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করি, তাতে আমাদের কোনো লজ্জাবোধ হয় না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, প্রচলিত ভাষা কাকে বলে। তার উত্তরে আমি বলি, যে ভাষা আমাদের সুপরিচিত, সম্পূর্ণ আয়ত্ত, এবং যা আমরা নিত্য ব্যবহার করে থাকি। তা খাঁটি বাংলাও নয়, খাঁটি সংস্কৃতও নয়, কিংবা উভয়ে মিলিত কোনোরূপ খিচুড়িও নয়। যে সংস্কৃত শব্দ প্রকৃত কিংবা বিকৃত -রূপে বাংলা কথার সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে, সে শব্দকে আমি বাংলা বলেই জানি এবং মানি। কিন্তু কেবলমাত্র নূতনত্বের লোভে নতুন করে যেসকল সংস্কৃত শব্দকে কোনো লেখক জোর করে বাংলাভাষার ভিতর প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ খাপ খাওয়াতে পারেন নি, সেইসকল শব্দকে ছুঁতে আমি ভয় পাই। এবং যেসকল সংস্কৃত শব্দ স্পষ্টত ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেইসকল শব্দ যাতে ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেবিষয়ে আমি লেখকদের সতর্ক হতে বলি। নইলে বঙ্গভাষার বনলতা যে সংস্কৃতভাষার উদ্যানলতাকে তিরস্কৃত করবে, এমন দুরাশা আমার মনে স্থান পায় না। শব্দকল্পদ্রুম থেকে আপনা হতে খসে যা আমাদের কোলে এসে পড়েছে, তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোনো আপত্তি নেই। তলার কুড়োও, কিন্তু সেইসঙ্গে গাছেরও পেড়ো না। তাতে যে পরিমাণ পরিশ্রম হবে, তার অনুরূপ ফললাভ হবে না।

শুধু গাছ থেকে পাড়া নয়, একেবারে তার আগ্‌ডাল থেকে পাড়া গুটিকতক শব্দের পরিচয় আমি সম্প্রতি বইয়ের মলাটে পেয়েছি। এবং সে সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা বক্তব্য আছে। যাঁরা 'শব্দাধিক্যাৎ অর্থাধিক্যং' মীমাংসার এই নিয়ম মানেন না, বরং তার পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে 'অধিকন্তু ন দোষায়'—এই উদ্ভট বচন অনুসারে কার্যানুবর্তী হয়ে থাকেন, তাঁরাও একটা গণ্ডির ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহসী হন না। এমন সাহিত্য-বীর বোধ হয় বাংলাদেশে খুব কম আছে, যারা বঙ্গরমণীর মাথায়

ধম্মিল্ল চাপিয়ে দিতে সংকুচিত না হয়, যদিচ সে বেচারারা নীরবে পুরুষের সব অত্যাচারই সহ্য করে থাকে। বঙ্কিমী যুগে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কিছু কম ছিল না। অথচ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও 'প্রাড়বিবাক্' বাক্যটি 'মলিম্লুচে'র ন্যায় কটু ভাষার হিসাবে গণ্য ক'রে চোর এবং বিচারপতিকে একই আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। 'প্রাড়বিবাক্' বেচারা বাঙালি-জাতির নিকট এতই অপরিচিত ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার ঐরূপ লাঞ্ছনাতেও কেউ আপত্তি করে নি। কিন্তু আজকাল ওর চাইতেও অপরিচিত শব্দও নতুন গ্রন্থের বক্ষে কৌস্তুভমণির মত বিরাজ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি দু-একটির উল্লেখ করব।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল জাতকবি। তাঁর ভালো-মন্দ-মাঝারি সকল কবিতাতেই তাঁর কবির জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় তাঁর রচিত এমন-একটি কবিতাও নেই, যার অন্তত একটি চরণেও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন না লক্ষিত নয়। সত্যের অনুরোধে একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাঁর নতুন পুস্তকের নামটিতে আমার একটু খটকা লেগেছিল। 'এষা' শব্দের সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি, এবং তার নামও আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। কাজেই আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে, হয়ত 'আয়েষা' নয়ত 'এশিয়া' কোনোরূপ ছাপার ভুলে 'এষা'-রূপ ধারণ করেছে। আমার এরূপ সন্দেহ হবার কারণও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যখন আয়েষাকে নিয়ে নভেল লিখেছেন, তখন তাকে নিয়ে অক্ষয়কুমার যে কবিতা রচনা করবেন, এতে আর আশ্চর্য হবার কারণ কি থাকতে পারে। 'আবার বলি ওসমান! এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।' —এই পদটির উপর রমণীহৃদয়ের সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ খাড়া করা কিছু কঠিন নয়। তারপর 'এশিয়া', প্রাচীর এই নবজাগরণের দিনে তার প্রাচীন নিদ্রাভঙ্গ করবার জন্য যে কবি উৎসুক হয়ে উঠবেন, এও তো স্বাভাবিক। যার ঘুম সহজে ভাঙে না, তার ঘুম ভাঙাবার দুটিমাত্র উপায় আছে— হয় টেনে-হিঁচড়ে, নয় ডেকে। এশিয়ার ভাগ্যে টানা-হেঁচড়ানো-ব্যাপারটা তো পুরোদমে চলছে, কিন্তু তাতেও যখন তার চৈতন্য হল না, তখন ডাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়াকে কাব্যে দর্শনে নানারূপ ঘুমপাড়ানি-মাসিপিসির গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। এখন আবার জাগাতে হলে এ যুগের কবিরা 'জাগর'-গান গেয়েই তাকে জাগাতে পারবেন। সে গান অনেক কবি স্বরে-বেস্বরে গাইতেও শুরু করে দিয়েছেন। সুতরাং আমার সহজেই মনে হয়েছিল যে, অক্ষয়কুমার বড়ালও সেই কার্যে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এখন শুনছি যে, ও ছাপার ভুল নয়, আমারই ভুল। প্রাচীন গাথার ভাষায় নাকি 'এষা'র অর্থ অন্বেষণ। একালের লেখকেরা যদি শব্দের অন্বেষণে সংস্কৃতযুগ ডিঙিয়ে একেবারে প্রাচীন গাথা-যুগে গিয়ে উপস্থিত হন, তাহলে একেলে বঙ্গপাঠকদের উপর একটু অত্যাচার করা হয়;

কারণ, সেই শব্দের অর্থ-অন্বেষণে পাঠক যে কোন্‌দিকে যাবে তা স্থির করতে পারে না। আজকালকার বাংলা বুঝতে অমরের সাহায্য আবশ্যক, তারপর যদি আবার যাস্ক চর্চা করতে হয়, তাহলে বাংলাসাহিত্য পড়বার অবসর আমরা কখন পাব? যাস্কের সাহায্যেও যদি তার অর্থবোধ না হয়, তাহলে বাংলাসাহিত্যের চর্চা যে আমরা ত্যাগ করব, তাতে আর সন্দেহ কি। অর্থবোধ হয় না বলে যখন আমরা আমাদের পরকালের সদ্‌গতির একমাত্র সহায় যে সন্ধ্যা, তারই পাঠ বন্ধ করেছি, তখন ইহকালের ক্ষণিক সুখের লোভে যে আমরা গাথার শব্দে রচিত বাংলাসাহিত্য পড়ব, এ আশা করা যেতে পারে না। তাছাড়া বৈদিক এবং অতিবৈদিক ভাষা থেকে যদি আমরা বাক্যসংগ্রহ করতে আরম্ভ করি, তাহলে তান্ত্রিক ভাষাকেই বা ছাড়ব কেন। আমার লিখিত নতুন বইখানির নাম যদি আমি 'ফেৎকারিণী' 'ডামর' কিংবা 'উড্ডীশ' দিই, তাহলে কি পাঠকসম্প্রদায় খুব খুশি হবেন?

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুস্তিকাগুলির নামকরণবিষয়ে যে অপূর্বতা দেখিয়ে থাকেন, তা আমাকে ভীত না করুক, বিস্মিত করে। আমি সাহিত্যের বাজারে মাল যাচাই করবার জন্য কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে ব্যবসা খুলে বসি নি। সুতরাং সুধীন্দ্রবাবুর রচনার দোষগুণ দেখানো আমার কর্তব্যের মধ্যে নয়। একমাত্র মলাটে তাঁর লেখা যেটুকু আত্মপরিচয় দেয়, সেইটুকু আমার বিচারাধীন। 'মঞ্জুষা' 'করঙ্ক' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যে আমাদের একেবারে মুখ-দেখাদেখি নেই, একথা বলতে পারি নে। তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত পাঠিকাদের নিকট ও পদার্থগুলি যত সুপরিচিত, ও নামগুলি তাদৃশ নয়। তাছাড়া ঐরূপ নামের যে বিশেষ-কোনো সার্থকতা আছে; তাও আমার মনে হয় না। আমাদের কল্পনাজাত বস্তু আমরা প্যাটরায় পুরে সাধারণের কাছে দিই নে, বরং সত্যকথা বলতে গেলে মনের প্যাটরা থেকে সেগুলি বার করে জনসাধারণের চোখের সম্মুখে সাজিয়ে রাখি। করঙ্কের কথা শুনলেই তাম্বূলের কথা মনে হয়। পানের খিলির সঙ্গে সুধীন্দ্রবাবুর ছোটগল্পগুলির কি সাদৃশ্য আছে জানি নে। করুণ রস এবং পানের রস এক জিনিস নয়। আর-একটি কথা। তাম্বূলের সঙ্গেসঙ্গে চর্বিতচর্বণের ভাবটা মানুষের মনে সহজেই আসে। সে যাই হোক, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, সুধীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত 'বৈতানিক' শব্দ আমি বৈতালিক শব্দের ছাপান্তর মনে করেছিলুম। হাজারে ন-শ-নিরানব্বই জন বাঙালি পাঠক যে ও শব্দের অর্থ জানেন না, একথা বোধ হয় সুধীন্দ্রবাবু অস্বীকার করবেন না। আমার যতদূর মনে পড়ে তা'তে কেবলমাত্র ভৃগুপ্রোক্ত মানব-ধর্মশাস্ত্রে এক স্থলে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ জানা আবশ্যক মনে করি নি। এইরূপ নামে বইয়ের পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং

তার পরিচয় গোপন করাই হয়। বাংলা-সরস্বতীকে ছদ্মবেশ না পরালে যে তাঁকে সমাজে বার করা চলে না, একথা আমি মানি নে।

এই নামের উদাহরণ-ক'টি টেনে আনবার উদ্দেশ্য, আমার সেই প্রথম কথার প্রমাণ দেওয়া। সেকথা এই যে, বঙ্গসাহিত্যের ভিতর সমালোচনার মত নামকরণেও বিজ্ঞাপনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের আর-পাঁচটা দোষের ভিতর একটা হচ্ছে তার ন্যাকামি। ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া, এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে এবং ভাষায় মাধুর্যের ভান এবং ভঙ্গি। বঙ্গসাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার এত কথা বলা। আমরা এতটাই কোমলের ভক্ত হয়ে পড়েছি যে, শুদ্ধ স্বরকেও কোমল করতে গিয়ে বিকৃত করতে আমরা তিলমাত্র দ্বিধা করি নে। কথায় বলে, 'যত চিনি দেবে ততই মিষ্টি হবে'। কিন্তু শর্করার ভাগ অতিরিক্ত হলে মিষ্টান্নও যখন অখাদ্য হয়ে ওঠে, তাতে আর সন্দেহ কি। লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন, তাহলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে। ভাষা যদি প্রসন্ন হয়, তাহলেও তার কর্কশতাও সহ্য হয়। এ এতই সোজা কথা যে, এও যে আবার লোককে বোঝাতে হয়, এই মহা আপসোসের বিষয়। যখন বঙ্গসাহিত্যে অন্ধকার আর 'বিরাজ' করবে না, তখন এবিষয়ে আর কারও 'মনোযোগ আকর্ষণ' করবার দরকারও হবে না।

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

সাহিত্যে চাবুক

সেদিন স্টার-থিয়েটারে 'আনন্দ-বিদায়ে'র অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল শুনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হলুম। তার প্রথম কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত লোককে দর্শকমণ্ডলী লাঞ্ছিত করেছেন; এবং তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা দেবার উদ্দেশ্যেই রঙ্গমঞ্চে আনন্দ-বিদায়ের অবতারণা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রবাবু লিখেছেন যে, তিনি সকলরকম 'মি'র বিপক্ষে। ন্যাকামি জ্যাঠামি ভণ্ডামি বোকামি প্রভৃতি যেসকল 'মি'-ভাগান্ত পদার্থের তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির যে কোনো ভদ্রলোকেই পক্ষপাতী, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়; অন্তত পক্ষপাতী হলেও সেকথা কেউ মুখে স্বীকার করবেন না। কিন্তু সমাজে থাকতে হলেই পাঁচটি 'মি' নিয়েই আমাদের ঘর করতে হয়, এবং সেই কারণেই সুপরিচিত 'মি'গুলি, সাহিত্যে না হোক, জীবনে আমাদের সকলেরই অনেকটা সওয়া আছে। কিন্তু যা আছে, তার উপর যদি একটা নতুন 'মি' এসে আমাদের ঘাড়ে চাপে, তাহলে সেটা নিতান্ত ভয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। আমরা এতদিন নিরীহ প্রকৃতির লোক বলেই পরিচিত ছিলুম। কিছুদিন থেকে ষণ্ডামি নামে একটা নতুন 'মি' আমাদের সমাজে প্রবেশলাভ করেছে। এতদিন রাজনীতির রঙ্গভূমিতেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। সুরাট-কন্‌গ্রেসে সেই 'মি'র তাণ্ডবনৃত্যের অভিনয় হয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সুরাটে যে যবনিকাপতন হয়েছে, তা আর সহসা উঠবে না। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে, রাজনীতিতে প্রশ্রয় পেয়ে ষণ্ডামি ক্রমশ সমাজের অপরসকল দেশও অধিকার করে নিয়েছে। ষণ্ডামি-জিনিসটের আর যে ক্ষেত্রেই সার্থকতা থাক্, সাহিত্যে নেই; কেননা, সাহিত্যে বাহুবলের কোনো স্থান নেই। স্টার-থিয়েটারের বক্স হতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে গায়ের জোরে নামানো সহজ, কিন্তু তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে উচ্চ-আসন লাভ করেছেন, বাহুবলে তাঁকে সেখান থেকে নামানো অসম্ভব। লেখকমাত্রেই নিন্দাপ্রশংসা সম্বন্ধে পরাধীন। সমালোচকদের চোখরাঙানি সহ্য করতে লেখকমাত্রেরই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যজগতের ঢিলটে মারলে যে জড়জগতের পাটকেলটা আমাদের খেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ওরকম একটা নিয়ম প্রচলিত হলে সাহিত্যরাজ্যে আমাদের বাস করা চলবে না। কারণ একথা সর্ববাদিসম্মত যে, বুদ্ধির জোর গায়ের জোরের কাছে বরাবরই হার মানে। এই কারণেই শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং লজ্জিত।

২

কিন্তু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে, এ যুগের সাহিত্যে আবার 'কবির লড়াই' ফিরে আনবার প্রয়াস পেয়েছেন, তার জন্য আমি আরও বেশি দুঃখিত। ও কাজ একবার আরম্ভ করলে শেষটা খেউড় ধরতেই হবে। দ্বিজেন্দ্রবাবু বোধ হয় একথা অস্বীকার করবেন না যে, সেটি নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।

এ পৃথিবীতে মানুষে আসলে খালি দুটি কার্যই করতে জানে; সে হচ্ছে হাসতে এবং কাঁদতে। আমরা সকলেই নিজে হাসতেও জানি, কাঁদতেও জানি; কিন্তু সকলেরই কিছু-আর অপরকে হাসাবার কিংবা কাঁদাবার শক্তি নেই। অবশ্য অপরকে চপেটাঘাত করে কাঁদানো কিংবা কাতুকুতু দিয়ে হাসানো আমাদের সবারই আয়ত্ত, কিন্তু সরস্বতীর বীণার সাহায্যে কেবল দুটিচারটি লোকই ঐ কার্য করতে পারেন। যাঁদের সে ভগবৎদত্ত ক্ষমতা আছে, তাঁদেরই আমরা কবি বলে মেনে নিই। বাদবাকি সব বাজে লেখক। কাব্যে, আমার মতে শুধু তিনটিমাত্র রস আছে: করুণ রস, হাস্যরস, আর হাসিকান্নামিশ্রিত মধুর রস। যে লেখায় এর একটি-না-একটি রস আছে, তাই কাব্য; বাদবাকি সব নীরস লেখা। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি যা খুশি তা হতে পারে, কিন্তু কাব্য নয়। বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অদ্বিতীয়। তাঁর গানে হাস্যরস ভাবে কথায় সুরে তালে লয়ে পঞ্চীকৃত হয়ে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। হাসির গান তাঁর সঙ্গে জুড়িতে গাইতে পারে, বঙ্গসাহিত্যের আসরে এমন গুণী আর-একটিও নেই। কান্নার মত হাসিরও নানাপ্রকার বিভিন্ন রূপ আছে, এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে হাসি নানা আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে যে কেবল আমাদের মিষ্টি হাসিই হাসতে হবে, একথা আমি মানি নে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবু যে বলেছেন যে, কাব্যে বিদ্রূপের হাসিরও ন্যায্য স্থান আছে, সেকথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিসটের প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ দিলে শুধু তার উপ্‌টুকু থাকে কিন্তু তার রূপটুকু থাকে না। হাসতে হলেই আমরা অল্পবিস্তর দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দন্তবিকাশ করলেই যে সে ব্যাপারটা হাসি হয়ে ওঠে তা নয়: দাঁতখিঁচুনি বলেও পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে— সে ক্রিয়াটি যে ঠিক হাসি নয়, বরং তার উলটো, জীবজগতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং উপহাস-জিনিসটে সাহিত্যে চললেও কেবলমাত্র তার মুখভঙ্গিটি সাহিত্যে চলে না। কোনো জিনিস দেখে যদি আমাদের হাসি পায়, তাহলেই আমরা অপরকে হাসাতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র যদি রাগই হয়, তাহলে সে মনোভাবকে হাসির ছদ্মবেশ পরিয়ে

প্রকাশ করলে দর্শকমণ্ডলীকে শুধু রাগাতেই পারি। দ্বিজেন্দ্রবাবু এইকথাটি মনে রাখলে লোককে হাসাতে গিয়ে রাগাতেন না।

৩

দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেছেন যে, নাটকাকারে প্যারডি কোনো ভাষাতেই নেই। যা কোনো দেশে কোনো ভাষাতেই ইতিপূর্বে রচিত হয় নি, তাই সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি একটি অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বামিত্রের তপোবল আমাদের কারও নেই; সুতরাং বিশ্বামিত্রও যখন নূতন সৃষ্টি করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন, তখন আমরা যে হব, এ তো নিশ্চিত।

মানুষে মুখ ভ্যাংচালে দর্শকমাত্রই হেসে থাকে। কেন যে সে কাজ করে, তার বিচার অনাবশ্যক; কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, ওরূপ মুখভঙ্গি দেখলে মানুষের হাসি পায়। প্যারডি হচ্ছে সাহিত্যে মুখ-ভ্যাংচানো। প্যারডি নিয়ে যে নাটক হয় না, তার কারণ দু ঘণ্টা ধরে লোকে একটানা মুখ ভেংচে যেতে পারে না; আর যদিও কেউ পারে তো, দর্শকের পক্ষে তা অসহ্য হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য দেখা দেয় বলেই, এবং তার কোনো মানেমোদ্দা নেই বলেই, মানুষের মুখ-ভ্যাংচানি দেখে হাসি পায়। সুতরাং ভ্যাংচানির মধ্যে দর্শন বিজ্ঞান সুনীতি সুরুচি প্রভৃতি ভীষণ জিনিস সব পুরে দিতে গেলে ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে রুচিকর হয় না। ঐরূপ করাতে ভ্যাংচানির শুধু ধর্মনষ্টই হয়। শিক্ষাপ্রদ ভ্যাংচানির সৃষ্টি করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবু রসজ্ঞানের পরিচয় দেন নি। যদি প্যারডির মধ্যে কোনোরূপ দর্শন থাকে তো সে দন্তের দর্শন।

৪

দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁর 'আনন্দ-বিদায়ে'র ভূমিকায় প্রকারান্তরে স্বীকারই করেছেন যে, লোকহাসানো নয়, লোকশিক্ষা দেওয়াই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়; প্রহসন শুধু অছিলামাত্র। বেত হাতে গুরুমশাইগিরি করা, এ যুগের সাহিত্যে কোনো লোকের পক্ষেই শোভা পায় না। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'— একথা শুধু অবতীর্ণ ভগবানের মুখেই সাজে, সামান্য মানবের মুখে সাজে না। লেখকেরা যদি নিজেদের এক-একটি ক্ষুদ্র অবতারস্বরূপ মনে করেন, কিংবা যদি তাঁরা সকলে কেষ্টবিষ্টু হয়ে ওঠেন, তাহলে পৃথিবীর সাধুদেরও পরিত্রাণ হবে না, এবং দুষ্টদেরও শাসন হবে না; লাভের মধ্যে লেখকেরা পরস্পর শুধু কলমের খোঁচাখুঁচি করবেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ইচ্ছাও যে তাই হয়। এবং তিনি ঐরূপ খোঁচাখুঁচি

হওয়াটা যে উচিত, তাই প্রমাণ করবার জন্যে বিলেতি নজির দেখিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ওআর্ডস্‌ওআর্থকে ব্রাউনিং চাব্‌কেছিলেন, এবং ওআর্ডস্‌ওআর্থ বায়রন এবং শেলিকে চাব্‌কেছিলেন। বিলেতের কবিরা যে অহরহ পরস্পরকে চাবকা-চাব্‌কি করে থাকেন, এ জ্ঞান আমার ছিল না।

ওআর্ডস্‌ওআর্থ সম্বন্ধে ব্রাউনিং Lost Leader নামে যে একটি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন, সেটিকে কোনো হিসাবেই চাবুক বলা যায় না। কবিসমাজের সর্বমান্য এবং পূজ্য দলপতি দলত্যাগ করে অপর-দলভুক্ত হওয়াতে কবিসমাজ যে গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, ঐ কবিতাতে ব্রাউনিং সেই দুঃখই প্রকাশ করেছেন। ওআর্ডস্‌ওআর্থ যে বায়রন এবং শেলিকে চাব্‌কেছিলেন, একথা আমি জানতুম না। বায়রন অবশ্য তাঁর সমসাময়িক কবি এবং সমালোচকদের প্রতি দুহাতে ঘুঁষো চালিয়েছিলেন, কিন্তু সে আত্মরক্ষার্থ। অহিংসা পরমধর্ম হলেও আততায়ী-বধে পাপ নেই। দ্বিজেন্দ্রবাবু যে নজির দেখিয়েছেন, সেই নজিরের বলেই প্রমাণ করা যায় যে, চাবুক পদার্থটার বিলেতি কবিসমাজে চলন থাকলেও তার ব্যবহারে যে সাহিত্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে, তা নয়। ওআর্ডস্‌ওআর্থ শেলি বায়রন প্রভৃতি কোনো কবিই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর তাড়নার ভয়ে নিজের পথ ছাড়েন নি, কিংবা সাহিত্যরাজ্যে পাশ কাটিয়ে যাবারও চেষ্টা করেন নি। কবিমাত্রেরই মত যে 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরঃধর্মো ভয়াবহ'। চাবুকের ভয় কেবলমাত্র তারাই করে, যাদের 'স্বধর্ম' বলে জিনিসটা আদপেই নেই এবং সাহিত্যে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ শ্রেণীর লেখকেরা কি লেখেন আর না-লেখেন, তাতে সমাজের কিংবা সাহিত্যের বড়-কিছু আসে যায় না।

একথা আমি অস্বীকার করি নে যে, সাহিত্যে চাবুকের সার্থকতা আছে। হাসিতে রস এবং কষ দুইই আছে। এবং ঠিক মাত্রা-অনুসারে কষের খাদ দিতে পারলে হাস্যরসে জমাট বাঁধে। কিন্তু তাই বলে 'কষে'র মাত্রা অধিক বাড়ানো উচিত নয় যে, তাতে হাসি জিনিসটা ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে, যা খাঁটি মাল বাকি থাকে, তাতে শুধু 'কশাঘাত' করা চলে। সাহিত্যেও অপরের গায়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়াটা বীরত্বের পরিচয় নয়। দ্বিজেন্দ্রবাবু 'কষাঘাত'কে 'কশাঘাত' বলে ভুল করে ষত্ব-ণত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেন নি। সাহিত্যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর চাবুক প্রয়োগ করাটা অনাচার। সমগ্র সমাজের পৃষ্ঠেই ওর প্রয়োগটা সনাতন প্রথা। মিথ্যা যখন সমাজে আশকারা পেয়ে সত্যের সিংহাসন অধিকার করে বসে, এবং রীতি যখন নীতি ব'লে সম্মান লাভ করে ও সমগ্র সমাজের উপর নিজের শাসন বিস্তার করে, তখনই বিদ্রূপের দিন আসে। পৃথিবীতে সব চাপা যায়, কিন্তু হাসি চাপা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি

চাবুকের প্রয়োগ চলে না! কোনো লেখক যদি নিতান্ত অপদার্থ হয়, তাহলে তার উপর কশাঘাত করাটা কেবল নিষ্ঠুরতা ; কেননা, গাধা পিটে ঘোড়া হয় না। অপরপক্ষে যদি কোনো লেখক সত্যসত্যই সরস্বতীর বরপুত্র হন, তাহলে তাঁর লেখার কোনো বিশেষ অংশ কিংবা ধরণ মনোমত না হলেও, সেই বিশেষ ধরণের প্রতি যেরূপ বিদ্রূপ সংগত, সেরূপ বিদ্রূপকে আর যে নামেই অভিহিত কর, 'চাবুক' বলা চলে না। কারণ, ওরূপ ক্ষেত্রে কবির মর্যাদা রক্ষা না করে বিদ্রূপ করলে সমালোচকেরও আত্মমর্যাদা রক্ষিত হয় না। কোনো ফাঁক পেলেই কলি যেভাবে নলের দেহে প্রবেশ করেছিলেন, সমালোচকের পক্ষে সেইভাবে কবির দেহে প্রবেশ করা শোভনও নয়, সংগতও নয়।

৫

চাবুক ব্যবহার করবার আর-একটি বিশেষ দোষ আছে। ও কাজ করতে করতে মানুষের খুন চড়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রবাবুরও তাই হয়েছে। তিনি একমাত্র 'চাবুকে' সন্তুষ্ট না থেকে, ক্রমে 'ঝাঁটিকা' 'চাঁটিকা' প্রভৃতি পদার্থেরও প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন। আমি বাংলায় অনাবশ্যক 'ইকা'-প্রত্যয়ের বিরোধী। সুতরাং আমি নির্ভয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবুকে এই প্রশ্ন করতে পারি যে, 'চাঁটিকা'র 'ইকা' বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, সে-জিনিসটে মারাতে কি কোনো লেখকের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়? 'ঝাঁটা' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সম্মার্জনীর উদ্দেশ্য ধুলোঝাড়া, গায়ের ঝালঝাড়া নয়। বিলেতিসরস্বতী মাঝে মাঝে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করলেও বঙ্গসরস্বতীর পক্ষে ঝাঁটা উঁচিয়ে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওয়াটা যে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়, একথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

৬

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিজে মার-মূর্তি ধারণ করবার যে কারণ দেখিয়েছেন, আমার কাছে সেটি সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল। দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতে, 'যদি কোনো কবি কোনো কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাব্‌কাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য'।

এককথায়, সাহিত্যের মঙ্গলের জন্য নৈতিক চাবুক মারাই দ্বিজেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায়। পৃথিবীতে অনেক লোকের ধারণা যে কাউকে ধর্মাচরণ শেখাতে হলে মৃত্যুর মত তার চুল চেপে ধরাটাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, এবং সেইজন্য কর্তব্য। স্কুলে জেলখানায় ঐ সমাজের মঙ্গলের জন্যই বেত মারবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজকাল অনেকেরই এ জ্ঞান জন্মেছে যে, ও পদ্ধতিতে সমাজের কোনো মঙ্গলই সাধিত হয় না ; লাভের মধ্যে, শুধু, যে বেত মারে এবং যাকে মারা হয়, উভয়েই তার ফলে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্ব লাভ করে।

অপরের উপর অত্যাচার করবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োগটা যে বর্বরতা, একথা সকলেই মানেন ; কিন্তু একই উদ্দেশ্যে নৈতিক বলের প্রয়োগটাও যে বর্বরতামাত্র, এ সত্য আজও সকলের মনে বসে যায় নি। কঠিন শাস্তি দেবার প্রবৃত্তিটি আসলে রূপান্তরে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি। ও জিনিসটিকে সমাজের মঙ্গলজনক মনে করা শুধু নিজের মনভোলানো মাত্র। নীতিরও একটা বোকামি গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামি আছে। নিত্যই দেখতে পাওয়া যায়, একরকম প্রকৃতির লোকের হাতে নীতি-পদার্থটা পরের উপর অত্যাচার করবার একটা অস্ত্রমাত্র। ধর্ম এবং নীতির নামে মানুষকে মানুষ যত কষ্ট দিয়েছে, যত গর্হিত কায করেছে, এমন বোধ হয় আর কিছুরই সাহায্যে করে নি। আশা করি দ্বিজেন্দ্রবাবু সে শ্রেণীর লোক নন, যাঁদের মতে সুনীতির নামে সাত খুন মাপ হয়। ইতিহাসে এর ধারাবাহিক প্রমাণ আছে যে, নীতির বোকামি গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামির অত্যাচার সাহিত্যকে পুরো-মাত্রায় সহ্য করতে হয়েছে। কারণ, সাহিত্য সকল দেশে সকল যুগেই বোকামি গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামির বিপক্ষ এবং প্রবল শত্রু।

নীতির, অর্থাৎ যুগবিশেষে প্রচলিত রীতির, ধর্মই হচ্ছে মানুষকে বাঁধা ; কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। কাজেই পরস্পরের সঙ্গে দা-কুমড়োর সম্পর্ক। ধর্ম এবং নীতির দোহাই দিয়েই মুসলমানেরা আলেকজাণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরি ভস্মসাৎ করেছিল। এ যুগে অবশ্য নীতিবীরদের বাহুবলের এক্তিয়ার হতে আমরা বেরিয়ে গেছি, কিন্তু সুনীতির গোয়েন্দারা আজও সাহিত্যকে চোখে-চোখে রাখেন, এবং কারও লেখায় কোনো ছিদ্র পেলেই সমাজের কাছে লেখককে ধরিয়ে দিতে উৎসুক হন। কাব্যামৃত-রসাস্বাদ করা এক, কাব্যের ছিদ্রান্বেষণ করা আর। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কবিতার রূপকমাত্র। কারণ, সে বাঁশির ধর্মই এই যে, তা 'মনের আকূতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে'। ছিদ্রান্বেষী নীতিধর্মীদের হাত পড়লে সে বাঁশির ফুটোগুলো যে তাঁরা বুজিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন, তাতে আর সন্দেহ কি। একশ্রেণীর লোক চিরকালই এই চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছেন ; কারণ, সে ছিদ্র স্বয়ং ভগবানের হাতে-করা বিঁধ, তাকে নিরেট করে দেবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। 'মি'-জিনিসটিই খারাপ, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষের পক্ষে সবচাইতে সর্বনেশে 'মি' হচ্ছে 'আমি'। কারণ, ও পদার্থটির আধিক্য থাকলে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সবই লুপ্ত হয়ে আসে। অন্যান্য সকল 'মি' ঐ 'আমি'কে আশ্রয় করেই থাকে। কিন্তু 'আমি' এত অব্যক্তভাবে আমাদের সমস্ত মনটায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে যে, আমরা নিজেও বুঝতে পারি নে যে, তারই তাড়নায় আমরা পরের উপর কুব্যবহার করতে উদ্যত হই, সমাজ কিংবা সাহিত্য কারও মঙ্গলের জন্য নয়। এই কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে আমরা পরের উপর নৈতিক চাবুক প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত

হই। এই কারণেই, যদি একজন কবি অপর-একজন সমসাময়িক কবির সমালোচক হয়ে দাঁড়ান, তাহলে তাঁর নিকট কবি এবং কাব্যের ভেদবুদ্ধিটি নষ্ট হওয়া অতি সহজ।

৭

দ্বিজেন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হতে দুর্নীতির যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা হাস্যরসাত্মক না হোক, হাস্যকর বটে। 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না'—একথাটা ভারতবাসীর পক্ষে যে অপ্রীতিকর, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য; কেননা যামিনী গেলেও আমরা জাগবার বিপক্ষে। আমরা শুধু রাতে নয়, অষ্টপ্রহর ঘুমতে চাই। সুতরাং যদি কেউ অন্ধকারের মধ্যেই চোখ খোলবার পক্ষপাতী হন, তাহলে তাঁব উপর বিরক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সে যাই হোক, ও গানটিতে বঙ্গসাহিত্যের যে কি অমঙ্গল ঘটেছে, তা আমি বুঝতে পারলুম না। এদেশের কাব্যরাজ্যে অভিসার বহুকাল হতে প্রচলিত আছে। রাধিকার নামে বেনামি করলে ও কবিতাটি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রবাবুর বোধ হয় আর-কোনো আপত্তি থাকত না। আমরা যে নাম-জিনিসটির এতটা অধীন হয়ে পড়েছি, সেটা আমাদের পক্ষে মোটেই শ্লাঘার বিষয় নয়। আর যদি দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতে ও গানটি ভদ্রসমাজে অশ্রাব্য হয়, তাহলে সেটির প্যারডি করে তিনি কি তাকে এতই সুশ্রাব্য করে তুলেছেন যে, সেটি রঙ্গালয়ে চীৎকার করে না গাইলে আর সমাজ উদ্ধার হয় না? দ্বিজেন্দ্রবাবু যেমন বিলেতি নজিরের বলে চাব্‌কা-চাব্‌কি বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত করতে চেয়েছেন, তেমনি তিনি আমাদের সাহিত্যে বিলেতি puritanismএর ভূত নামাতে চান। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু puritanism-নামক ন্যাকামি এবং গোঁড়ামি হতে এদেশীয় সাহিত্য চিরকালই মুক্ত ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত যদি আমাদের গ্রাহ্য করতে হয়, তাহলে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' থেকে শুরু করে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পর্যন্ত অন্তত হাজার বৎসরের সংস্কৃতকাব্যসকল আমাদের অগ্রাহ্য করতে হবে; একখানিও টিঁকবে না। তারপর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সকল কবির সকল গ্রন্থই আমাদের অস্পৃশ্য হয়ে উঠবে; একখানিও বাদ যাবে না। যাঁরা রবীন্দ্রবাবুর সরস্বতীর গাত্রে কোথায় কি তিল আছে তাই খুঁজে বেড়ান, তাঁরা যে ভারতবর্ষের পূর্বকবিদের সরস্বতীকে কি করে তুষারগৌরীরূপে দেখেন, তা আমার পক্ষে একেবারেই দুর্বোধ্য। শেষ কথা, puritanismএর হিসেব থেকে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রবাবুও কিছু কম অপরাধী নন। তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই রয়েছে। 'আনন্দ-বিদায়' moral text-book বলে গ্রাহ্য হবে, এ আশা যদি তিনি করে থাকেন, তাহলে সে আশা সফল হবে না।

মাঘ ১৩১৯

তরজমা

আমরা ইংরেজজাতিকে কতকটা জানি, এবং আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন হিন্দু-জাতিকে তার চাইতেও বেশি জানি; আমরা চিনি নে শুধু নিজেদের।

আমরা নিজেদের চেনবার কোনো চেষ্টাও করি নে, কারণ আমাদের বিশ্বাস যে, সে জানার কোনো ফল নেই; তা ছাড়া নিজেদের ভিতর জানবার মত কোনো পদার্থ আছে কি না, সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে।

বাঙালির নিজস্ব বলে মনে কিংবা চরিত্রে যদি কোনো পদার্থ থাকে, তাকে আমরা ডরাই; তাই চোখের আড়াল করে রাখতে চাই। আমাদের ধারণা যে, বাঙালি তার বাঙালিত্ব না হারালে আর মানুষ হয় না। অবশ্য অপরের কাছে তিরস্কৃত হলে আমরা রাগ করে ঘরের ভাত (যদি থাকে তো) বেশি করে খাই; কিন্তু উপেক্ষিত হলেই আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই। মান এবং অভিমান এক জিনিস নয়। প্রথমটির অভাব হতেই দ্বিতীয়টি জন্মলাভ করে।

আমরা যে নিজেদের মান্য করি নে, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি— হয় বর্তমান ইউরোপের দিকে এগনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছনো। আমরা নিজের পথ জানি নে বলে আজও মনঃস্থির করে উঠতে পারি নি যে, পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুটির মধ্যে কোন্ দিক অবলম্বন করলে আমরা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছব। কাজেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন-পা এগিয়ে আবার ভারতবর্ষের দিকে দু-পা পিছিয়ে আসি, আবার অগ্রসর হই, আবার পিছু হটি। এই কুর্নিশ করাটাই আমাদের নব-সভ্যতার ধর্ম ও কর্ম।

উক্ত ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবসূচক না হলেও মেনে নিতে হবে। যা মনে সত্য বলে জানি, সেসম্বন্ধে মনকে চোখ ঠেরে কোনো লাভ নেই। আমরা দোটানার ভিতর পড়েছি— এই সত্যটি সহজে স্বীকার করে নিলে আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে আসবে। যা আজ উভয়সংকট বলে মনে হচ্ছে, তাই আমাদের উন্নতির স্রোতকে একটি নির্দিষ্ট পথে বদ্ধ রাখবার উভয়কূল বলে বুঝতে পারব। আমরা যদি চলতে চাই তো আমাদের একূল-ওকূল দুকূল রক্ষা করেই চলতে হবে।

আমরা স্পষ্ট জানি আর না-জানি, আমরা এই উভয়কূল অবলম্বন করেই চলবার চেষ্টা করছি। সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম আছে। সেই যুগধর্ম অনুসারে চলতে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। আমাদের এ যুগ সত্যযুগও নয় কলিযুগ নয়— শুধু তরজমার যুগ। আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও একেলে

বিদেশী এবং সেকেলে স্বদেশী সভ্যতার অনুবাদ করেই দিন কাটাই। আমাদের মুখের প্রতিবাদও ঐ একই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সংস্কৃতের অনুবাদ করে নূতনের প্রতিবাদ করি, এবং ইংরেজির অনুবাদ করে পুরাতনের প্রতিবাদ করি। আসলে রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য— সকল ক্ষেত্রেই তরজমা করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং আমাদের বর্তমান যুগটি তরজমার যুগ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে ঐ অনুবাদ-কার্যটি ষোলোআনা ভালোরকম করার উপর আমাদের পুরুষার্থ এবং কৃতিত্ব নির্ভর করছে।

পরের জিনিসকে আপনার করে নেবার নামই তরজমা। সুতরাং ও কার্য করাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, এবং নিজেদের দৈন্যের পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেননা, নিজের ঐশ্বর্য না থাকলে লোকে যেমন দান করতে পারে না, তেমনি নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে লোকে গ্রহণও করতে পারে না। স্মৃতির মতে, দাতা এবং গ্রহীতার পরস্পর যোগ না হলে দানক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। একথা সম্পূর্ণ সত্য। মৃত ব্যক্তি দাতাও হতে পারে না, গ্রহীতাও হতে পারে না; কারণ দান এবং গ্রহণ উভয়ই জীবনের ধর্ম। বুদ্ধদেব যিশুখৃষ্ট মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিকট কোটি-কোটি মানব ধর্মের জন্য ঋণী। কিন্তু তাঁদের দত্ত অমূল্য রত্ন তাঁদের হাত থেকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁদের সমকালবর্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল। এবং শিষ্যপরম্পরায় তাঁদের মত আজ লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে গুরু হওয়া বেশি শক্ত, কিংবা শিষ্য হওয়া বেশি শক্ত, বলা কঠিন। যাঁদের বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্গে স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, পুরাকালে গুরুরা কাউকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করবার পূর্বে শিষ্যের সে বিদ্যা গ্রহণ করবার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা করতেন। উপনিষদ্‌কে গুহ্যশাস্ত্র করে রাখবার উদ্দেশ্যই এই যে, যাদের শিষ্য হবার সামর্থ্য নেই, এমন লোকেরা ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিদ্যে ফলাতে না পারে। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, শক্তিমান গুরু হবার একমাত্র উপায় পূর্বে ভক্তিমান শিষ্য হওয়া। বর্তমান যুগে আমরা ভক্তি-পদার্থটি ভুলে গেছি, আমাদের মনে আছে শুধু অভক্তি ও অতিভক্তি। এ দুয়ের একটিও সাধুতার লক্ষণ নয়, তাই ইংরেজি-শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপর কাউকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।

আমরা কথায় বলি, জ্ঞানলাভ করি; কিন্তু আসলে জ্ঞান উত্তরাধিকারীস্বত্বে কিংবা প্রসাদস্বরূপে লাভ করবার পদার্থ নয়। আমরা সজ্ঞানে জন্মলাভ করি নে, কেবল জ্ঞান অর্জন করবার ক্ষমতামাত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হই। জানা-ব্যাপারটি মানসিক চেষ্টার

অধীন, জ্ঞান একটি মানসিক ক্রিয়া মাত্র; এবং সে ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ বিকাশ। মন-পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ স্লেট নয়, যার উপর বাহ্যজগৎরূপ পেন্‌সিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায়; অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটও নয়, যা কোনোরূপ অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যজগতের ছায়া ধরে রাখে। যে প্রক্রিয়ার বলে আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিজের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে নিজের অন্তর্ভূত করে নিতে পারি তারই নাম জ্ঞান! আমরা মনে-মনে যা তরজমা করে নিতে পারি, তাই আমরা যথার্থ জানি; যা পারি নে, তার শুধু নামমাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ঐ তরজমা করার শক্তির উপরই মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। সুতরাং একাগ্রভাবে তরজমা-কার্যে ব্রতী হওয়াতে আমাদের পুরুষকার বৃদ্ধি পাবে বই ক্ষীণ হবে না।

আমি পূর্বে বলেছি যে, আমরা সকলে মিলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, হয় ইউরোপীয় নয় আর্য সভ্যতার তরজমা করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ফলে আমরা তরজমা না করে শুধু নকলই করছি। নকল করার মধ্যে কোনোরূপ গৌরব বা মনুষ্যত্ব নেই। মানসিক শক্তির অভাববশতই মানুষে যখন কোনো জিনিস রূপান্তরিত করে নিজের জীবনের উপযোগী করে নিতে পারে না, অথচ লোভবশত লাভ করতে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না; তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চার অভাববশত দিন-দিন সে শক্তি হ্রাস হতে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমরা নিজেদের চারিপাশে জড়ো করেও সেটিকে অন্তরঙ্গ করতে পারি নি; তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা মাঝেমাঝে সেটিকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য ছট্‌ফট্ করি। মানুষে যা আত্মসাৎ করতে পারে না তাই ভস্মসাৎ করতে চায়। আমরা মুখে যাই বলি নে কেন, কাজে পূর্ব-সভ্যতা নয়, পশ্চিম সভ্যতারই নকল করি; তার কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের চোখের সুমুখে সশরীরে বর্তমান, অপরপক্ষে আর্যসভ্যতার প্রেতাত্মামাত্র অবশিষ্ট। প্রেতাত্মাকে আয়ত্ত করতে হলে বহু সাধনার আবশ্যক। তাছাড়া প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, দেহমুক্ত আত্মার সম্পর্কে আসতে হলে অপর-একটি দেহতে তাকে আশ্রয় দেওয়া চাই; একটি প্রাণীর মধ্যস্থতা ব্যতীত প্রেতাত্মা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আমাদের সমাজের প্রাচীন দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রাণ নেই। শব প্রেতাত্মা কর্তৃক আবিষ্ট হলে মানুষ হয় না, বেতাল হয়। বেতাল-সিদ্ধ হবার দুরাশা খুব কম লোকেই রাখে; কাজেই শুধু মন নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ রয়েছে, সাধারণত লোকে তারই অনুকরণ করে। অনুকরণ ত্যাগ করে যদি আমরা এই নব-সভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তাহলেই সে

সভ্যতা নিজস্ব হয়ে উঠবে, এবং ঐ ক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব, এবং বাঙালির বাঙালিত্ব ফুটিয়ে তুলব।

তরজমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে এখন কি উপায়ে আমরা সেবিষয়ে কৃতকার্য হব সেসম্বন্ধে আমার দু-চারটি কথা বলবার আছে।

সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসাবে সত্য এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বলে সংসারযাত্রার উপযোগী সকল কার্য করতে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম— যার ফল একে নয় দশে লাভ করে, তা— করবার জন্য মনোবল আবশ্যক। সমাজে সাহিত্যে যা-কিছু মহৎকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন-পদার্থ টি বিদ্যমান। যা মনে ধরা পড়ে তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেইকথা অবশেষে কার্যরূপে পরিণত হয়; কথার সূক্ষ্মশরীর কার্যরূপ স্থূলদেহ ধারণ করে। আগে দেহটি গড়ে নিয়ে, পরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাটি একেবারেই বৃথা। কিন্তু আমরা রাজনীতি সমাজ-নীতি ধর্ম সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ নিজের রূপ নিজেই গড়ে নেয়। নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলেই বীজ ক্রমে বৃক্ষ-রূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারি, তাহলেই আমাদের সমাজ নবকলেবর ধারণ করবে। এই নবসভ্যতাকে মনে সম্পূর্ণরূপ পরিপাক করতে পারলেই আমাদের কান্তি পুষ্ট হবে। কিন্তু যতদিন সে সভ্যতা আমাদের মুখস্থ থাকবে কিন্তু উদরস্থ হবে না, ততদিন তার কোনো অংশই আমরা জীর্ণ করতে পারব না। আমরা যে, ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তরজমা করতে পারি নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ মনোভাবসকল শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় করে রয়েছে, সমগ্র জাতির মনে স্থান পায় নি। আমরা ইংরেজি ভাব ভাষায় তরজমা করতে পারি নে বলেই আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না, বোঝে শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত লোকে। এদেশের জনসাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মত কিছু নেই; আমাদের নিজস্ব বলে কোনো পদার্থ নেই— আমরা পরের সোনা কানে দিয়ে অহংকারে মাটিতে পা দিই নে। অপরপক্ষে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেবার মত ধন ছিল, তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজও সমগ্র জাতি ধনী হয়ে আছে। ঋষিবাক্যসকল লোকমুখে এমনি সুন্দর ভাবে তরজমা হয়ে গেছে যে, তা আর তরজমা বলে কেউ বুঝতে পারেন না। এদেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে

বোঝাতে হয় না, অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়। আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহ গ্রহণ করলে পূর্বদেহের স্মৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহত্যাগ ক'রে অপর-একটি ভাষার দেহ অবলম্বন করে, তাহলেই সেটি যথার্থ অনূদিত হয়।

উপযুক্ত তরজমার গুণেই বৈদান্তিক মনোভাবসকল হিন্দুসন্তানমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে। এদেশে এমন লোক বোধ হয় নেই, যার মনটিকে নিংড়ে নিলে অন্তত এক ফোঁটাও গৈরিক রং না পাওয়া যায়। আর্যসভ্যতার প্রেতাত্মা উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ তার আত্মাটি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সুষুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যদি আবশ্যক হয় তো সেটিকে সহজেই জাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক কথাটি বলতে পারলে অপরের মনের দ্বার আরব্য-উপন্যাসের দস্যুদের ধনভাণ্ডারের দ্বারের মত আপনি খুলে যায়। আমরা, ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা, জনসাধারণের মনের দ্বার খোলবার সংকেত জানি নে, কারণ আমরা তা জানবার চেষ্টাও করি নে। যেসকল কথা আমাদের মুখের উপর আল্‌গা হয়ে রয়েছে কিন্তু মনে প্রবেশ করে নি, সেগুলি আমাদের মুখ থেকে খসে পড়লেই যে অপরের অন্তরে প্রবেশলাভ করবে, এ আশা বৃথা।

আমরা যে আমাদের শিক্ষালব্ধ ভাবগুলি তরজমা করতে অকৃতকার্য হয়েছি, তার প্রমাণ তো সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দু বেলাই পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত-নাটকের প্রাকৃত 'সংস্কৃত-ছায়া'র সাহায্য ব্যতীত বুঝতে পারা যায় না, তেমনি আমাদের নব-সাহিত্যের কৃত্রিম প্রাকৃত ইংরেজি-ছায়ার সাহায্য ব্যতীত বোঝা যায় না। সমাজে না হোক, সাহিত্যে 'চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা'। কিন্তু আমাদের নব-সাহিত্যের বস্তু যে চোরাই-মাল, তা ইংরেজি-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই কাছে ধরা পড়ে। আমরা ইংরেজি-সাহিত্যের সোনারূপো যা চুরি করি, তা গলিয়ে নিতেও শিখি নি। এই তো গেল সাহিত্যের কথা। রাজনীতি-বিষয়ে আমাদের সকল ব্যাপার যে আগাগোড়াই নকল, এবিষয়ে বোধ হয় আর দু-মত নেই, সুতরাং সেসম্বন্ধে বেশিকিছু বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মনে-মনে বিশ্বাস যে, ধর্ম এবং দর্শন এই দুটি জিনিস আমাদের একচেটে; এবং অন্য কোনো বিষয়ে না হোক, এই দুই বিষয়ে আমাদের সহজ কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবাসীদের এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, তার প্রমাণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে মনুর ধর্ম রিলিজিঅন হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভুল তরজমার বলে ব্যবহারশাস্ত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ধর্মশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রের ভেদজ্ঞান আমাদের লুপ্ত হয়েছে। ধর্মের অর্থ ধরে রাখা এবং

মোক্ষের অর্থ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এ দুয়ের কাজ যে এক নয়, তা শুধু ইংরেজিনবিশ আর্য-সন্তানরাই বুঝতে পারেন না।

গীতা আমাদের হাতে পড়বামাত্র তার হরিভক্তি উড়ে যায়। সেই কারণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নব্য পণ্ডিতসমাজে শুধু বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর গীতার কর্ম ইংরেজি work-রূপ ধারণ করে আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে; অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের কর্ম কাণ্ডহীন হয়েই আমাদের কাছে উচ্চ বলে গণ্য হয়েছে। এই ভুল তরজমার প্রসাদেই, যে কর্মের উদ্দেশ্য পরের হিত এবং নিজের আত্মার উন্নতিসাধন— পরলোকের অভ্যুদয়ও নয়, সেই কর্ম আজকাল ইহলোকের অভ্যুদয়ের জন্য ধর্ম বলে গ্রাহ্য হয়েছে। যে কাজ মানুষে পেটের দায়ে নিত্য করে থাকে, তা করা কর্তব্য— এইটুকু শেখাবার জন্য ভগবানের যে ভোগায়তন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্যকতা ছিল না— এ সোজা কথাটাও আমরা বুঝতে পারি নে। ফলে আমাদের-কৃত গীতার অনুবাদ বক্তৃতাতেই চলে, জীবনে কোনো কাজে লাগে না।

একদিকে আমরা এদেশের প্রাচীন মতগুলিকে যেমন ইংরেজি পোশাক পরিয়ে তার চেহারা বিলকুল বদলে দিই, তেমনি অপরদিকে ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানকেও আমরা সংস্কৃতভাষার ছদ্মবেশ পরিয়ে লোকসমাজে বার করি।

নিত্যই দেখতে পাই যে, খাঁটি জর্মান মাল স্বদেশী বলে পাঁচজনে সাহিত্যের বাজারে কাটাতে চেষ্টা করছে। হেগেলের দর্শন শংকরের নামে বেনামি করে অনেকে কতক পরিমাণে অজ্ঞ লোকদের কাছে চালিয়েও দিয়েছেন। আমাদের মুক্তির জন্য হেগেলেরও আবশ্যক আছে, শংকরেরও আবশ্যক আছে; কিন্তু তাই বলে হেগেলের মস্তক মুণ্ডন করে তাঁকে আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কন্থা পরিয়ে শংকর বলে সাহিত্যসমাজে পরিচিত করে দেওয়াতে কোনো লাভ নেই। হেগেলকে ফকির না করে যদি শংকরকে গৃহস্থ করতে পারি, তাতে আমাদের উপকার বেশি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ ভুল তরজমা অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইভলিউশনের কথাটা ধরা যাক। ইভলিউশনের দোহাই না দিয়ে আমরা আজকাল কথাই কইতে পারি নে। আমরা উন্নতিশীল হই আর স্থিতিশীলই হই আমাদের সকল-প্রকার শীলই ঐ ইভলিউশন আশ্রয় করে রয়েছে। সুতরাং ইভলিউশনের যদি আমরা ভুল অর্থ বুঝি, তাহলে আমাদের সকল কার্যই যে আরম্ভে পর্যবসিত হবে সে তো ধরা কথা। বাংলায় আমরা ইভলিউশন 'ক্রমবিকাশবাদ' 'ক্রমোন্নতিবাদ' ইত্যাদি শব্দে তরজমা করে থাকি। ঐরূপ তরজমার ফলে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে যে,